করোনা অতিমারি এবং পুঁজিবাদ

পঞ্চম অংশ

অতিমারি এবং ওষুধ শিল্পের মুনাফা

আপডেট স্টাডি গ্রুপ, ০৫.০৬.২০২০

নিউমোনিয়ায় বিশ্বে প্রতি বছরে আট লক্ষের বেশি পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মারা যায়, প্রতি দিনে ২০০০ জনেরও বেশি। ভারতে প্রতি ঘণ্টায় ১৪ জনেরও বেশি শিশু নিউমোনিয়ার গ্রাসে প্রাণ হারায়। বছরে প্রায় এক লক্ষ সাতাশ হাজার। নিউমোনিয়ার মুখ্য কারণ হল অপুষ্টি ও দূষণ। (সূত্র ১) অবশ্য, নিউমোনিয়া প্রতিরোধের ভ্যাক্সিন আছে। ব্রিটিশ কোম্পানি গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন এবং মার্কিন কোম্পানি ফাইজার এই ভ্যাক্সিনগুলির মালিক। ভারতে ফাইজার কোম্পানির ভ্যাক্সিন ব্যবহৃত হয়। একটা সম্পূর্ণ ডোজের দাম ২৫০ ডলার বা বর্তমান বাজার দরে ১৮ হাজার ৮৩৪ টাকা। 'মহানুভব' ফাইজার কোম্পানি ভারতের শিশুদের ডিসকাউন্ট দেয়। প্রতি ডোজের দাম পড়ে আট পাউন্ড বা ৭৫৮ টাকা ৮৩ পয়সা। কিন্তু এত 'মহানুভবতার' পরও ভারতের গরিবের থেকেও গরিব পরিবারের শিশুদের বরাদ্দে তা জোটানো সম্ভব হয় না। ফলে মারা পড়াই যেন তাদের ভবিতব্য। তবে, ফাইজার কোম্পানি শুধু নিউমোনিয়ার ভ্যাক্সিন বেচে বছরে ৪৫০ কোটি পাউন্ড আয় করে। (সূত্র ২)

পশ্চিম আফ্রিকায় কর্পোরেট ফিসিং বা যান্ত্রিক উপায়ে মাছ ধরার ফলে ওখানকার অধিবাসীদের মাছ জুটত না। প্রোটিনের অভাবে তারা গভীর জঙ্গলে বাঁদর ও শিম্পাঞ্জি শিকার করে মাংস খাওয়া শুরু করেছিল। ফলে তারা প্রাণি-বাহিত এইডস (বা এইচ আই ভি)-তে আক্রান্ত হল। বিদেশী ওষুধ কোম্পানি তার ওষুধও তৈরি করে ফেলল। এক বছরের জন্য সেই ওষুধের দাম পড়ত ১০ হাজার থেকে ১৫ হাজার ডলার! ফলে যা হবার তাই হল। কোটি কোটি গরিব আফ্রিকান মারা পড়ল। ১৯৯৪ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত মৃত্যুমিছিল চলল। বিশ্বের অন্যত্রও এইডস হয়ে দাঁড়াল কালান্তক যম। একটি ভারতীয় কোম্পানি ভিন্ন পদ্ধতিতে এইডস-এর ওষুধ তৈরি করল। দাম দিনে এক ডলার বা বছরে ৩৫০ ডলার। কিন্তু বিদেশী কোম্পানির মালিকানাধীন ওষুধ ভিন্ন পদ্ধতিতে তৈরি করার জন্য সেই সময়ে কম জল ঘোলা হয়নি। যাই হোক, বিস্তর জোরজুলুম, মনকষাকষি, দরাদরি, ইত্যাদির পর ভারতীয় কোম্পানির কম দামি ওষুধ গ্রাহ্য হল। এখন বিশ্বের এইডস-এর ৮০ শতাংশ ওষুধ সরবরাহ করে ঐ ভারতীয় কোম্পানি। (সূত্র ৩)

এই ধরনের দৃষ্টান্ত প্রচুর। যেমন, মার্কিন কোম্পানি জিলিদ সায়েন্স – করোনা চিকিৎসার ওষুধের জন্য মার্কিন সরকার যাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে – এমনকি ভারত সরকারও যাদের থেকে ওষুধ আমদানির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেছে – সেই জিলিদ কোম্পানি হেপাটাইটিস সি রোগের চিকিৎসার জন্য যে ওষুধ তৈরি করেছে তা দিয়ে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসায় খরচ পড়ছে ছয় অঙ্কের। অথচ, তার উৎপাদন ব্যয় মাত্র ১০০ ডলার! কয়েক বছরের মধ্যে জিলিদ শুধু ঐ ওষুধটি বেচে ৭০০ কোটি ডলার কামিয়ে নিয়েছে। (সূত্র ৪)

বস্তুত, নানাবিধ ভ্যাক্সিন, ওষুধ, চিকিৎসার সরঞ্জাম, রোগ প্রতিরোধক সামগ্রী, ইত্যাদির উপর বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলো মেধাস্বত্ব নামক এক বিধির সহায়তায় একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ তথা মালিকানা কায়েম করে রেখেছে। এই একচেটিয়া মালিকানার সূত্রে তারা ভ্যাক্সিন, ওষুধ, ইত্যাদির দাম করেছে আকাশছোঁয়া। আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সরকার এই বহুজাতিকদের হাতেই করোনা ভাইরাসের ভ্যাক্সিন নির্মাণ ও ওষুধ প্রস্তুতির ভার দিয়েছে। শোনা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রায় একশোটি সংস্থা/কোম্পানি ভ্যাক্সিন তৈরির গবেষণায় নেমে পড়েছে। তবে, কবে সেই ভ্যাক্সিন বাজারে আসবে – এক বছর নাকি দুই বছর, নাকি আরও বেশি – সেটা কেউই বলতে পারছে না। ততদিনে ভাইরাসের গ্রাসে কতজন প্রাণ দেবে তাও জানা নেই। এমনকি ভ্যাক্সিন তৈরির আগেই রোগের প্রকোপ হ্রাস পেতে পেতে কোভিড-১৯ ভাইরাস আপাতত বিদায় নেবে কিনা তা-ও জানা নেই।

ভ্যাক্সিন গবেষণায় সম্প্রতি তৎপরতা লক্ষিত হলেও ভ্যাক্সিন উৎপাদনে ওষুধ কোম্পানিগুলোর উঁচু হারে লাভের সম্ভাবনা নাকি খুব একটা বেশি নয়। অথচ একটি মতে, ভ্যাক্সিন-বাজার ২০১৪ সালের পর দ্বিগুণ হয়ে গেছে। গত বছরে ভ্যাক্সিন-বাজারের আয়তন ছিল ৫৪০০ কোটি ডলার। (সূত্র ৫) অবশ্য অন্যান্য ব্যবসার তুলনায় সবচেয়ে দ্রুত গতিতে বর্ধনশীল সামগ্রিক ওষুধ ব্যবসার আয়তন হল ১২ লক্ষ কোটি ডলার। (সূত্র ৬) অর্থাৎ, সামগ্রিক ওষুধ ব্যবসার মধ্যে ভ্যাক্সিন-ব্যবসা মাত্র ৪.৫ শতাংশ! ১৯৬৭ সালে ভ্যাক্সিন কোম্পানি ছিল ২৬টি। ১৯৮০-তে তা দাঁড়াল ১৭টিতে। এখন তা আরও কমে একক অঙ্কে পৌঁছেছে। (সূত্র ৭) চারটি বৃহদাকার কর্পোরেশন ভ্যাক্সিন ব্যবসার ৮৫ শতাংশ দখলে রেখেছে। এরা হল, ব্রিটেনের গ্ল্যাক্সোস্মিথক্লাইন, ফ্রান্সের স্যানোফি এবং মার্কিন দেশের মার্ক ও ফাইজার। বিশ্বের ৯৪টি দরিদ্রতম দেশে ভ্যাক্সিন ব্যবসা করে প্রতি ১ ডলার বিনিয়োগ করে তারা ৪৪ ডলার কামিয়ে নিয়েছে। (সূত্র ৮) অথচ, ওষুধ কোম্পানিগুলোর পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, ভ্যাক্সিন গবেষণায় বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করা, দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালানো (১-৮ বছর), প্রাণি ও মানুষের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো, সরকারের থেকে লাইসেন্স পাওয়া, ইত্যাদির ঝক্কি সামলে মুনাফা নাকি এমন কিছু হয় না। ফলে অনেকেই গত ৪০-৫০ বছর ধরে শুধু ভ্যাক্সিন-উৎপাদন নয়, অ্যান্টি-বায়োটিক, অ্যান্ডি-ভাইরাল, অ্যান্টি-ফাঙ্গাল ব্যবসা থেকেও ক্রমশ সরে গিয়ে আরও লাভজনক ওষুধ ব্যবসায় বিনিয়োগ করেছে।

বহুজাতিক কোম্পানিগুলির কর্তা ও লগ্নিকারকদের ভিতরের কথা বেশ তাৎপর্যবহ। ২০১৮ সালে পৃথিবীখ্যাত লগ্নিকারী গোল্ডম্যান স্যাক্স প্রশ্ন তুলেছে, "রুগীদের চিকিৎসা করা কি আদৌ লাভজনক ব্যবসা?" (সূত্র ৯) প্রকৃতপক্ষে, রোগ প্রতিরোধের (প্রিভেনশন) থেকে রোগ নিরাময়ের (কেয়ার) ব্যবসা আরও বেশি লাভজনক বিবেচিত হচ্ছে। ধূমপান নিবারণের থেকে ক্যানসার বা ফুসফুসের ক্রনিক অসুখ নিরাময়ের ব্যবসা আরও লোভনীয়। আমেরিকায় ডাক্তারি ছাত্রদের রোগ প্রতিরোধের থেকে রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জ্ঞানবিজ্ঞান বেশি করে শেখানো হচ্ছে। (সূত্র ১০) তাই, ভ্যাক্সিন-গবেষণা হয়ে গেছে দুয়োরানি। প্রাধান্য পাচ্ছে ক্যানসার, ডায়াবেটিস, হৃৎযন্ত্রের গোলযোগ, আর্থ্রাইটিস, যৌন ক্ষমতা বৃদ্ধির ওষুধ-প্রস্তুতির কারবার। এছাড়া, চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত না থাকার কারণে অসুখ-রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে প্রধানত গরিব দেশগুলির সমস্যা। কিন্তু, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব ফার্মাসিউটিক্যাল ম্যানুফাকচারার্স-এর প্রধান হার্ভে বেল স্পষ্ট বলেছেন, "গরিব বিশ্বে কোনও বাজার নেই"। বার্নার্ড পিকলের মতে মুনাফার জন্য "উন্নত দেশের ৩০-৪০ কোটি ধনী ব্যক্তিদের উপরই নির্ভর করতে হবে"। (সূত্র ১১) অর্থাৎ, "গরিব বিশ্বে" বাজার নেই, সুতরাং সেখানকার মানুষের জীবনেরও কোনও দাম নেই! ২০১৮ সালে বিশ্ব ওষুধ শিল্পের গবেষণাখাতে মোট ব্যয়ের মাত্র ১ শতাংশ নির্ধারিত ছিল নতুন দেখা দেওয়া সংক্রামক রোগের জন্য। (সূত্র ১২) বস্তুত, উন্নত দেশে সংক্রামক রোগ মহামারি হিসেবে দেখা না গেলে সরকার ও পুঁজিপতিদের টনক নড়ে না। স্বয়ং 'হু'-র মতে বিশ্বে মোট ভ্যাক্সিন উৎপাদনের ৮২ শতাংশ যায় উন্নত দেশসমূহে – যেখানে মুনাফার হার অনেক বেশি। (সূত্র ১৩) জনৈক লগ্নিকারক বলেছেন, সংক্রামক রোগের চিকিৎসা লাভজনক নয়, কেননা "রুগীদের নিরাময় করলে তাদের থেকে ভাইরাস নতুন রুগীর দেহে ছড়ানোর সম্ভাবনা হ্রাস পায়"! (সূত্র ১৪) এককথায়, পুঁজিবাদী বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর কাছে মন্ত্র একটাই: 'যত বেশি রোগ, যত বেশি রুগী, তত বেশি মুনাফা'!

প্রকৃতপক্ষে, গত দুই দশকে ভাইরাস-ঘটিত সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেলেও ইবোলা ছাড়া আর কোনও ভ্যাক্সিন আবিষ্কৃত হয়নি। সার্স, মার্স (দু'টিই করোনা ভাইরাস পরিবারভুক্ত), নিপা, হান্টা, ইত্যাদির গবেষণা নানা সময়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত ভ্যাক্সিন আবিষ্কার হয়ে ওঠেনি। বলা বাহুল্য, বিনিয়োগের সমস্যাই ছিল এর প্রধান কারণ। যেমন, ২০০৩ সালে করোনা-ভাইরাস পরিবারভুক্ত সার্স রোগ মহামারি হলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার ৫০ কোটি পাউন্ড গবেষণাখাতে বিনিয়োগ করে এবং ভ্যাক্সিন-উৎপাদক কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করে। কিন্তু সার্স রোগ ২০০৪ সালে কমতে কমতে আপাতভাবে বিলীন হয়ে গেলে গবেষণা, বিনিয়োগ স্তব্ধ হয়ে যায়। ভ্যাক্সিন-নির্মাতা কোম্পানিও হাত গুটিয়ে নেয়। ইয়েল স্কুল অব পাবলিক হেল্থ-এর অধ্যাপক জেসন স্কোয়ার্জ বলেছেন, "তখন সার্স ভ্যাক্সিন গবেষণা থেকে সরে না এলে এখন আমরা (করোনা) ভাইরাসের ভ্যাক্সিন প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনেকটা এগিয়ে থাকতাম।" অর্থাৎ, করোনা ভাইরাস ভ্যাক্সিনের জন্য গবেষণা আবার প্রায় শূন্য থেকে শুরু করতে হচ্ছে। (সূত্র ১৫) সৌদি আরবে মার্স মহামারি দেখা দিলে ভ্যাক্সিন নির্মাণের গবেষণা শুরু হল, কিন্তু মহামারির প্রকোপ স্তিমিত হলেই গবেষণা বন্ধ করে দেওয়া হল। একজন জীবতত্ত্ববিদ

বলেছেন, "সার্স ও মার্স উভয় রোগে মাত্র সাড়ে বারো হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল। এটা কোনও বাজার নয়। কেসের সংখ্যা খুবই কম। ওষুধ কোম্পানিগুলো উৎসাহী নয়।" (সূত্র ১৬) অর্থাৎ, বাজার, ব্যবসা, মুনাফার হারই নির্ধারক, মানুষের জীবন নয়।

বর্তমানে কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন গবেষণার ক্ষেত্রে নানা দেশে তৎপরতা দেখা যাচ্ছে। তবে, সংক্রমণের রেখচিত্র নিম্নগামী হতে শুরু করলে উপরোক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি অসম্ভব কিছু নয়। এখন পর্যন্ত কোম্পানিগুলো সংক্রমণের ক্রমবর্ধমান পরিমাণে খুবই উল্লসিত। গেরাল্ড পসনার – যিনি 'ফার্মা: গ্রিড, লায়েজ, অ্যান্ড দ্য পয়জনিং অব আমেরিকা'র মতো গ্রন্থে ওষুধ কোম্পানিগুলোর মুনাফালোভী চরিত্রকে উন্মোচিত করেছেন – তিনি বলেছেন, "ওষুধ কোম্পানিগুলি কোভিড-১৯-কে জীবনে একবার মাত্র এমন ব্যবসার সুযোগ আসে বলে দেখছে।" সাম্প্রতিক অতিমারি সংকট হল "ওষুধশিল্পের কাছে উঁচু মাত্রার বিক্রি ও মুনাফার সম্ভাব্য সুযোগ... অতিমারি যতই সংকটজনক হবে, ততই তাদের মুনাফা বাড়বে।" জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানি ইতিমধ্যে ১৬০ কোটি ডলার বিনিয়োগের কথা ঘোষণা করেছে। মডার্না নামক একটি মার্কিন কোম্পানি – যাদের সঙ্গে মার্কিন সরকার ভ্যাক্সিন উৎপাদনের চুক্তি করেছে – গবেষণা শুরু করা মাত্র তাদের শেয়ারের দাম এই মন্দার বাজারেও ১০ শতাংশ বেড়ে গেছে। ব্যবসার উপর লেখালেখি করেন এমন একজনের মতে যদি মডার্না করোনা ভ্যাক্সিনের দাম ৬০০ ডলার রাখে, তবে চীনের হুবেই প্রদেশ থেকেই সে ৩ হাজার ৭১০ কোটি ডলার তুলে নেবে। (সূত্র ১৭)

কিন্তু, ওষুধ কোম্পানিগুলি যা মুনাফা করে তা কি সোজা পথে আসে? প্রকৃতপক্ষে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যখাতে গবেষণায় বিপুল বরাদ্দ করা হয়, বছরে প্রায় ৪ হাজার ১৭০ কোটি ডলার। (সূত্র ১৮) নানা সংস্থার মাধ্যমে এই খরচ করা হয় – যেমন, বিশ্ববিদ্যালয়, ল্যাবরেটরি, আধা-সরকারি সংস্থা এবং অবশ্যই নানাবিধ ওষুধ কোম্পানি। কিন্তু বিস্ময়কর হল, সরকার থেকে বিপুল বিনিয়োগ সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ওষুধ বা ভ্যাক্সিনগুলির পেটেন্ট কিংবা মেধাস্বত্ব চলে যায় ওষুধ কোম্পানিগুলির দখলে। এর জন্য ওষুধ কোম্পানিগুলি আইনপ্রণেতাদের প্রভাবিত করার জন্য (না কি 'ঘুষ'?) কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার খরচ করে। যেমন, ২০১৯ সালে তারা খরচ করেছে ২৯৫০ লক্ষ ডলার। এতো খরচ আর কোনও ব্যবসা বা শিল্প করে না। এই খরচ এমনকি তেল-গ্যাস শিল্পের থেকেও দ্বিগুণ বেশি। (সূত্র ১৯) এছাড়া আছে নানা রকম 'দু-নম্বরী' প্রথা। যেমন নতুন ওষুধগুলি যাতে দ্রুত সরকারি অনুমোদন পায় তার জন্য নানা 'অনুদান', মানুষের উপর প্রয়োগের কোনও নেতিবাচক ফলাফল থাকলে তাকে চেপে দেওয়ার জন্য মিথ্যা খবরের প্রকাশনা, ভুতুড়ে ডাক্তার দিয়ে নব-আবিষ্কৃত ওষুধের গুণকীর্তন, ইত্যাদি। (সূত্র ২০) তবে সবার উপরে থাকে ওষুধগুলির মেধাস্বত্বের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ – যার বলে তারা যথেচ্ছভাবে ওষুধের দাম নির্ধারণ করে। যেমন হেপাটাইটিস সি রোগের একটি ওষুধের দাম মার্কিন বাজারে ১৮ হাজার ডলার, অথচ তার উৎপাদন খরচ মাত্র ৫ ডলার! (সূত্র ২১) মাইলান ফার্মাসিউটিক্যাল যে হর্মোন ইনজেকশনের দাম নেয় ৩০০ ডলার, তার উৎপাদন খরচ মাত্র ১০ ডলার। (সূত্র ২২) দৃষ্টান্ত অগুন্তি। মানুষের জীবন এখানে নিতান্তই গৌণ বিষয়। মূল প্রেরণা হল অতি মুনাফা।

করোনা চিকিৎসার ক্ষেত্রেও উপরোক্ত ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা প্রবল। প্রথমে ধরা যাক, এন-৯৫ মাস্কের কথা। এই মাস্ক উৎপাদনকারী বিশ্বের প্রথম দশটি কোম্পানির মধ্যে আটটি হল মার্কিন – যাদের মধ্যে ৩এম এবং হনিওয়েলের অবস্থান সবার আগে। বস্তুত, ৩এম কোম্পানি ৪০০-রও বেশি শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণকারী যন্ত্রের পেটেন্ট নিয়ে রেখেছে। আমেরিকায় এন-৯৫ মাস্কের বড় মাত্রায় অভাব দেখা দিল এবং ৩এম কোম্পানি কানাডা ও লাতিন আমেরিকায় মাস্ক রপ্তানির উদ্যোগ নিল। তৎক্ষণাৎ ট্রাম্প প্রশাসন তাদের উপর ১৯৫০ সালের ডিফেন্স প্রোডাকশন অ্যাক্ট চাপানোর হুমকি দেয়। ফলে ৩এম আমেরিকায় মাস্ক সরবরাহ করতে বাধ্য হয়। (সূত্র ২৩)

দ্বিতীয়ত, ইবোলা রোগের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় যে রেমডেসিভির নামক ওষুধ, জানা গেছে তা করোনা রোগের উপসমে কাজে লাগছে। তাৎপর্যপূর্ণ হল, এই ওষুধটির গবেষণায় মার্কিন সরকার ৭৯০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করেছে। অথচ এই ওষুধের উপর জিলিদ কোম্পানির ৭০টি দেশে ২০৩৮ সাল পর্যন্ত পেটেন্ট নেওয়া আছে। (সূত্র ২৪) বাজারে ওষুধটির দাম ধার্য করা আছে রুগী পিছু ৪০০০ ডলার, তবে ওষুধটির উৎপাদন খরচ পড়ে রুগী পিছু ৯ ডলার। (সূত্র ২৫) গতিপ্রকৃতি আন্দাজ করে একজন মার্কিন সেনেটর জ্যান স্কাওস্কি মার্কিন সরকারের হেল্থ অ্যান্ড হিউম্যান রিসোর্সেস সেক্রেটারি অ্যালেক্স

অ্যাজারকে ওষুধটি সবার কাছে সহজলভ্য করার জন্য অনুরোধ করেন। জবাবে অ্যাজার সাহেব – যিনি আগে এলি লিলি অ্যান্ড কোং নামক একটি বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানির প্রধান ছিলেন – তিনি বলেন, "আমি এই দামকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারব না, কারণ আমরা চাই ব্যক্তিগত মালিকানার বিনিয়োগ"। (সূত্র ২৬) এটা একটি ওষুধের দৃষ্টান্ত মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, করোনা চিকিৎসায় আরও যে-সব ওষুধের ব্যবহারের সম্ভাবনা দেখা দেবে তাদের ক্ষেত্রেও প্রশ্ন উঠবে ওষুধটির পেটেন্ট কার দখলে এবং ওষুধটির দাম কত। যেমন, চীনে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ গভীরতর হতেই ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধ ক্লোরোকুইন করোনা রোগের ক্ষেত্রেও কাজে দেবে এমন কথা উঠল এবং বিশ্ববাজারে সেই ওষুধের দাম ৯৮ শতাংশ বেড়ে গেল। (সূত্র ২৭)

ভাইরাস-ব্যাক্টেরিয়া সহ নানা পরজীবীর আক্রমণের বিরুদ্ধে বর্মব্যবস্থা অর্থাৎ ভ্যাক্সিন এবং রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ আবিষ্কারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা। দেড়শো-দুশো বছর আগে পদানত উপনিবেশে শাসনব্যবস্থা মসৃণভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং মূলত সৈন্যসামন্ত ও ইউরোপীয় (পরে মার্কিন) কর্মচারীদের ম্যালেরিয়া, স্মল পক্স, পীতজ্বর, প্লেগ, ডিপথেরিয়া, ইত্যাদি রোগের হাত থেকে রক্ষার্থে ভ্যাক্সিন ও ওষুধ গবেষণার প্রয়োজন পড়েছিল। বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে ম্যালেরিয়ার মতো রোগ ভারতে এনেছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা – সেচব্যবস্থার প্রচলন করে। (সূত্র ২৮) যাই হোক, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হতে না হতেই ১৯১৮-১৯ সালে যে স্প্যানিশ ফ্লু দেখা দিল, যুদ্ধে যতজন নিহত হয়েছিল তাতে তার থেকেও বেশি সেনানী ও মানুষ প্রাণ হারাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা সতর্ক হয়ে বিশেষ গবেষণা পরিকাঠামো গড়ে তুলল। মার্কিন সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকেও গবেষণা শুরু হয়েছিল এবং গত শতাব্দীতে তারা ২৮টি ভ্যাক্সিনের মধ্যে ১৮টি প্রস্তুত করেছিল। (সূত্র ২৯) ১৯৬৭ সালেও প্রায় বারোটি মার্কিন ওষুধ কোম্পানি ভ্যাক্সিন গবেষণায় নিযুক্ত ছিল। কিন্তু প্রচলিত ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল রেগন-থ্যাচারের নয়া-উদারনৈতিক পুঁজিবাদের হাত ধরে। ১৯৭০-র দশক থেকে উন্নত দেশগুলিতে স্বাস্থ্যব্যবস্থার ব্যাপক মাত্রার বেসরকারিকরণ ঘটল। কিছু পরে ডবল্যু.টি.ও. নামক সাম্রাজ্যবাদী বাণিজ্য সংস্থার মাধ্যমে ওষুধ উৎপাদনকারী কোম্পানিগুলির হাতে ২০ বছরের জন্য উদ্ভাবিত ভ্যাক্সিন/ওষুধের মেধাস্বত্ব তুলে দেওয়া হল। যারা তা মানবে না তার বিরুদ্ধে কড়া অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার হুমকি দেওয়া হল। অনেক দরকষাকষির পর ২০০১ সালে মেধাস্বত্ব আইন লঙ্ঘনের সামান্য কিছু সুবিধা (কমপালসরি লাইসেন্স) দেওয়া হল বটে, কিন্তু মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী নেতৃত্বে বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞার মতো নানা ব্যবস্থা নেওয়ার রাস্তা খোলা রইল।

২০১২ সালে ভারত সরকার উপরোক্ত কমপালসরি লাইসেন্স বিধি ব্যবহার করে ন্যাটকো নামক ভারতীয় কোম্পানিকে নেক্সাভার নামক ক্যানসারের ওষুধ উৎপাদনে সবুজ সঙ্কেত দেয়। ঘটনাচক্রে এই ওষুধটির মেধাস্বত্ব ছিল বহুজাতিক বেয়ার কোম্পানির দখলে এবং বিশ্ববাজারে ওষুধটির দাম ছিল বছরে ৬৫ হাজার ডলার। ফলে বেয়ার কোম্পানির প্রধান ম্যারিন ডেকার্স ক্রোধান্বিত হয়ে বলেছিলেন, এটা "চৌর্যবৃত্তি", "আমরা ভারতীয়দের জন্য এই ওষুধ তৈরি করিনি... আমরা তা তৈরি করেছি পশ্চিমিদের জন্য যারা ঐ খরচ বহনে সক্ষম"। (সূত্র ৩০) ২০১৬ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কলম্বিয়াকে 'শাস্তি' দিয়েছিল কেননা তারা মার্কিন কোং নোভারতিস যে ক্যানসারের ওষুধ নির্মাণ করে তার পেটেন্ট ভেঙে ব্যবহার শুরু করেছিল। (সূত্র ৩১)

মেধাস্বত্ব বিধির ব্যবহার করে ওষুধ কিংবা ভ্যাক্সিনের দাম বহু গুণে বৃদ্ধি করার আশঙ্কা এখন কোভিড-১৯ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। রোসে হোল্ডিং নামক ফরাসি কোম্পানি – যারা কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন তৈরিতে যুক্ত – তার প্রধান কর্তা বলেছেন, মেধাস্বত্ব আইন "তুলে দেওয়া হবে ধ্বংসাত্মক।... আমাদের হাতে যদি মেধাস্বত্ব না থাকে তবে কেউ-ই কোনও কিছু প্রস্তুত করবে না।... যদি কোনও লাভ না থাকে তবে কে বিনিয়োগ করবে?" (সূত্র ৩২) সত্যিই তো! মুনাফা না হলে ব্যবসা কীসের! আর সেই ক্ষেত্রে মেধাস্বত্বই তো আসল চাবিকাঠি! বস্তুত, ভ্যাক্সিন-ওষুধের উপর বহুজাতিকদের অবাধ নিয়ন্ত্রণের জোরে তারা কোনও দেশের উপর যে কোনও দাম চাপিয়ে দিতে পারে। সেগুলির ব্যবহারে নানা শর্ত আরোপ করতে পারে।

কিছুদিন আগে কোস্টা রিকার মতো ছোট একটি দেশ 'হু'-র কাছে এক প্রস্তাব পেশ করে। তার সারমর্ম হল, কোভিড-১৯ ভাইরাসের প্রতিরোধক্ষম সমস্ত ভ্যাক্সিন, ওষুধ, চিকিৎসার সামগ্রীর উপর থেকে পেটেন্ট কিংবা মেধাস্বত্ব আইন প্রত্যাহার

করে নিয়ে সেগুলির ফরমুলা, ডিজাইন, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা ও সফটওয়্যারকে সব মানুষের সম্পত্তি করে তোলা হোক। (সূত্র ৩৩) তাদের এই প্রস্তাবটিকে 'সলিডারিটি কল টু অ্যাকশন' নামে 'হু' গ্রহণ করেছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে কোস্টা রিকার এই উদ্যোগে সামিল হয়েছে ৩৭টি মূলত অনুন্নত দেশ (যার মধ্যে ভারত নেই, কিন্তু নরওয়ে, নেদারল্যান্ডের মতো উন্নত দেশ আছে)। (সূত্র ৩৪) মডার্না কোম্পানি, যারা মার্কিন সরকারের থেকে ৪৮ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার অনুদান নিয়ে করোনা ভ্যাক্সিন-গবেষণায় নিযুক্ত হয়েছে, তার সিইও বলেছেন এই প্রস্তাবটি নাকি তারা 'ভেবে দেখবে'। জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানি, যারা মার্কিন সরকারের থেকে ৬০ কোটি ডলার অনুদান নিয়ে ভ্যাক্সিন ও ওষুধ তৈরিতে যুক্ত হয়েছে, এই প্রস্তাবে প্রেক্ষিতে তারা জানিয়েছে যে নির্মীয়মান ভ্যাক্সিন/ওষুধ যাতে সবার পক্ষে 'সহজলভ্য' হয় তার জন্য নাকি চেষ্টা করা হবে। (সূত্র ৩৫) অতীতে এইচআইভি, হেপাটাইটিস সি-র চিকিৎসার ক্ষেত্রে তারা যে দৃষ্টান্ত রেখেছে, তার ফলে তাদের মুখের কথাকে কেউ বিশ্বাস করবে কি না জানা নেই। বলা বাহুল্য, এই উদ্যোগে ট্রাম্প প্রশাসনের কোনও সমর্থন পাওয়া যায়নি। বরং ট্রাম্প সাহেব 'হু'-কে একহাত নিয়ে তার টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। উপরন্তু, ট্রাম্প সাহেব মার্চ মাসে কিওরভ্যাক নামক এক জার্মান কোম্পানির সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করতে চাইছিল যাতে তারা কোভিড-১৯-এর ভ্যাক্সিন উদ্ভাবিত হলে তার সমস্ত অধিকার মার্কিন সরকারের হাতে তুলে দেয়। জার্মানিতে এর তীব্র প্রতিক্রিয়া হওয়াতে ঐ কোম্পানি পিছিয়ে যায়। (সূত্র ৩৬)

১৯৫৫ সালে জোনাস সল্ক পোলিও রোগের ভ্যাক্সিন আবিষ্কার করেছিলেন। তার আবিষ্কারের ফলে পোলিও রোগে পঙ্গুত্বের হাত থেকে লক্ষ লক্ষ শিশু নিষ্কৃতি পেয়েছিল। কিন্তু তিনি আবিষ্কৃত ভ্যাক্সিনের পেটেন্ট নিতে অস্বীকার করলেন। কারণ হিসেবে তিনি বলেছিলেন, ''আপনি কি সূর্যের পেটেন্ট নিতে চান?'' (সূত্র ৩৭) জোনাস সল্ক বড্ড 'বোকা' ছিলেন। অতিমারির সময়ে ট্রাম্প সাহেবদের নেতৃত্বে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিগুলো যেভাবে অতি মুনাফার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে, মেধাস্বত্ব আইনের মাধ্যমে আসন্ন (?) ভ্যাক্সিন কিংবা ওষুধের উপর মালিকানা কায়েম করতে চাইছে তার ফলে ইতিহাস থেকে জোনাস সল্কের মতো ব্যক্তিত্ব হারিয়ে যেতে বসেছে।

কোস্টা রিকা কিংবা জোনাস সল্কের দৃষ্টান্ত খুব অর্থবহ। প্রকৃতপক্ষে, যতদিন ওষুধ, ভ্যাক্সিন, বা সামগ্রিক স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর ব্যক্তিগত তথা পুঁজিবাদী মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকবে, থাকবে বহুজাতিকদের অতি-মুনাফা করার ব্যবস্থা, ততদিন মানুষের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলতেই থাকবে। তাই, অতিমারি জানান দিচ্ছে উৎপাদিকা শক্তি ও স্বাস্থ্য-পরিষেবার উপর সামাজিক তথা সমগ্র মানুষের মালিকানা প্রতিষ্ঠা ছাড়া বর্তমান সংকট থেকে বেরোনো সম্ভব নয়।

সূত্র:

১) ১৩.১১.২০১৯, https://theprint.in/health/pneumonia-killed-more-than-14-children-every-hour-in-india-in-2018-unicef-study/320398/; ৩১.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

২) ১৫.০৪.২০, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/15/coronavirus-treatment-drug-companies; ২৭.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৩) ২৮.০৫.২০, https://mronline.org/2020/05/28/u-s-declares-a-vaccine-war-on-the-world/; ৩০.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৪) ১৫.০৫.২০, https://diginomica.com/after-covid-19-where-does-us-pharma-and-biotech-industry-stand; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৫) ১৩.০২.২০, https://www.bbc.com/news/business-51454859; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৬) ২৪.০৩.২০, https://www.marxist.com/pandemics-profiteering-and-big-pharma-how-capitalism-plagues-public-health.htm; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৭) ১০.০২.১৫, https://www.theatlantic.com/business/archive/2015/02/vaccines-are-profitable-so-what/385214/; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৮) ২৩.০২.২০, https://www.cnbc.com/2020/02/21/coronavirus-brings-light-to-the-35-billion-vaccine-market.html; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

৯) ১৮.০৪.১৮, https://www.cnbc.com/2018/04/11/goldman-asks-is-curing-patients-a-sustainable-business-model.html; ১২.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১০) ২৮.০৪.১৮, https://www.mhealthtalk.com/profit/; ১৮.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১১) সূত্র ৬ দ্রষ্টব্য।

১২) ০৪.০৩.২০, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/04/market-coronavirus-vaccine-us-health-virus-pharmaceutical-business#; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।

১৩) সূত্র ৭ দ্রষ্টব্য।
১৪) ০২.০৪.২০, https://www.jacobinmag.com/2020/02/coronavirus-outbreak-free-market-pharmaceutical-industry; ১৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
১৫) সূত্র ৬ দ্রষ্টব্য।
১৬) সূত্র ১৪ দ্রষ্টব্য।
১৭) সূত্র ৬ দ্রষ্টব্য।
১৮) https://www.nih.gov/about-nih/what-we-do/budget; ৩০.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
১৯) ১৪.০৩.২০, https://theintercept.com/2020/03/13/big-pharma-drug-pricing-coronavirus-profits/; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২০) ২৪.০৪.২০, https://www.solidarity.net.au/highlights/coronavirus-and-capitalism-big-pharmas-addiction-to-profit/; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২১) ১২.০৫.২০, https://www.wionews.com/world/human-lives-above-profits-us-pharma-companies-eye-pandemic-boom-298302; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২২) ০৭.০৫.২০, https://www.juancole.com/2020/05/interested-profiteering-coronavirus.html; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২৩) ২৪.০৪.২০, https://www.newsclick.in/COVID-19-Pandemic-Public-Health-Private-Profits-Vaccines-Masks-Patent; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২৪) সূত্র ২ ও ৪ দ্রষ্টব্য।
২৫) ১৪.০৫.২০, https://www.oxfam.org/en/press-releases/vaccinating-poorest-half-humanity-against-coronavirus-could-cost-less-four-months; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২৬) সূত্র ৪ দ্রষ্টব্য।
২৭) সূত্র ৬ দ্রষ্টব্য।
২৮) ২৪.০১.২০০৮, https://www.workers.org/2008/world/malaria_0131/; ৩১.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
২৯) ১১.০৫.২০, https://newrepublic.com/article/157594/no-coronavirus-vaccine-big-pharma-drug-patent-system; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
৩০) সূত্র ৩ দ্রষ্টব্য।
৩১) সূত্র ২৯ দ্রষ্টব্য।
৩২) ১৩.০৫.২০, https://www.pbp.ie/are-the-profiteers-blocking-a-vaccine-for-covid-19/; ১৫.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
৩৩) সূত্র ২ ও ৩ দ্রষ্টব্য।
৩৪) https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov/covid-19-technology-access-pool/solidarity-call-to-action; ০৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।
৩৫) ০২.০৬.২০, https://theintercept.com/2020/06/02/big-pharma-coronavirus-treatment-price-gouging/; ০৩.০৬.২০-এ সংগৃহীত।
৩৬) ১৬.০৩.২০, https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/mar/16/trump-coronavirus-vaccine-big-pharma-president-drugs-industry-profit; ২৬.০৫.২০-এ সংগৃহীত।
৩৭) সূত্র ২২ দ্রষ্টব্য।

Suvro Mallick <suvro.mallick2@gmail.com>